পঞ্চম অধ্যায়

আদর্শ জীবনচরিত

আদর্শকে আরবিতে 'উছওয়া' (أُسْوَةٌ) বলে। আদর্শ বলতে অনুকরণীয়, অনুসরণীয় ও গ্রহণযোগ্য চালচলন এবং রীতিনীতিকে বোঝায়। মানুষের সামগ্রিক জীবন সুন্দর ও সফল করতে মনীষীদের যেসব জীবনকর্ম অনুসরণ করা হয় তা-ই হলো জীবনাদর্শ। শেষ নবি ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (স.) হলেন আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ : "অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আল-আহযাব, আয়াত ২১)

হযরত মুহাম্মদ (স.)- এর দেখানো পথ অনুসরণ করে যাঁরা শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন এবং তাঁদের জীবনাদর্শ দ্বারা মানবজাতিকে সঠিক পথে চলতে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছেন, তাঁদের জীবনের ভালো দিকগুলোই হলো আমাদের জন্য আদর্শ।

আদর্শ জীবন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য : আদর্শ জীবন চরিত্রে দু'ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। যেমন, (ক) গ্রহণীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং (খ) বর্জনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

গ্রহণীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো হলো : (ক) মানুষের মাঝে সততা, বিশ্বস্ততা, উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতার সমন্বয় থাকা, (খ) আত্মসংযম, পরোপকারিতা, বদান্যতা, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, বিনয় ও নম্রতা থাকা এবং (গ) সুশৃঙ্খলা, পারস্পরিক সম্প্রীতি, নিরপেক্ষতা, ক্ষমা ও ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি গুণের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা।

বর্জনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- (ক) মানুষের মাঝে হিংসা, বিদ্বেষ, জিঘাংসা ও গোঁড়ামি থাকা; (খ) আড়ম্বরতা, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, পরনিন্দা ও অসত্য থাকা এবং (গ) অসহনশীলতা, দলাদলি, সাম্প্রদায়িকতা, অন্যায়, অত্যাচার, ব্যভিচার ও বেহায়াপনাসহ অশোভন সকল খারাপ আচরণে লিপ্ত থাকা।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- আদর্শ জীবনচরিতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব;
- প্রাক-ইসলামি যুগে আরবের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বর্ণনা করতে পারব;
- মহানবি (স.)-এর কিশোর বয়সের সততা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার অনন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে পারব;
- মহানবি (স.)-এর যৌবনকালের সুউচ্চ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বর্ণনা করতে পারব;
- মহানবি (স.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তি ও ইসলাম প্রচার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- মহানবি (স.)-এর মাদানি জীবনের ঘটনাবলি বর্ণনা করতে পারব;
- মহানবি (স.)-এর মদিনা সনদ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বর্ণনা করতে পারব;
- মহানবি (স.)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ ও ভাষণে প্রতিফলিত মানবাধিকার ও সাম্যের ধারণা, নারীর প্রতি সম্মানবোধ এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- মহানবি (স.)-এর মক্কা বিজয় ও ক্ষমার আদর্শ বর্ণনা করতে পারব;
- খুলাফায়ে রাশেদিনের পরিচয় ও জীবনাদর্শ বর্ণনা করতে পারব;

- খুলাফায়ে রাশেদিনের চরিত্রে প্রস্ফুটিত গুণাবলি : মানবসেবা, দানশীলতা, উদারতা, জ্ঞানচর্চা, প্রজাবাৎসল্য, ন্যায়বিচার ও সুশাসন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- মুসলিম মনীষীগণের চরিত্রে প্রস্ফুটিত গুণাবলি : সমাজসেবা, সাম্য, গণতান্ত্রিক চেতনা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা, সৌহার্দ, বিশ্বস্ততা, ত্যাগ ও ক্ষমা, দেশপ্রেম, পরোপকারিতা ও শিক্ষাবিস্তারে অবদান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষত চিকিৎসা, রসায়ন, ভূগোল ও গণিত শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ ১

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সমকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত নবি ও রাসুলগণের মধ্যে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) হলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে আরবের মানুষ চরম বর্বরতা ও অজ্ঞতার মাঝে ডুবে ছিল। তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল চরমভাবে অধঃপতিত। তারা অসংখ্য মূর্তি তৈরি করত এবং মূর্তির পূজা করত। গোত্রের ভিন্নতার পাশাপাশি তাদের মূর্তিও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। তারা পবিত্র কাবাঘরে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করেছিল। কালের এই চরম অবক্ষয়ের কারণে একজন পথপ্রদর্শক হিসেবে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরণ করেন। আল্লাহ তাঁর নিকট মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ করেন। মহানবি (স.) মানুষকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন।

সামাজিক অবস্থা

মহানবি (স.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব সমাজের লোকেরা নবি ও রাসুল এর শিক্ষা ভুলে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের আচার ব্যবহার ও চালচলন ছিল বর্বর ও মানবতাবিরোধী। তাই সে যুগকে 'আইয়্যামে জাহিলিয়্যা' বা অজ্ঞতার যুগ বলা হয়। সুষ্ঠু ও সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। মানুষের জান, মাল, ইজ্জতের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। নরহত্যা, রাহাজানি, খুন-খারাবি, ডাকাতি, মারামারি, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া, জুয়াখেলা, মদ্যপান, সুদ, ঘুষ, ব্যভিচার ছিল তখনকার প্রচলিত ব্যাপার। তৎকালীন সমাজে নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না। নারীদের সামাজিক জীব মনে করা হতো না; বরং দাসী হিসেবে তাদের বিক্রি করা হতো, ভোগ বিলাসের বস্তু মনে করা হতো। যার বর্ণনা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে এসেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের (ভূমিষ্ঠ হওয়ার) সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তাদের মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা খুবই নিকৃষ্ট।" (সূরা আন্-নাহল, আয়াত ৫৮-৫৯)

এক কথায় অপরাধের এমন কোনো দিক ছিল না যা তারা করত না।

সাংস্কৃতিক অবস্থা

জাহিলি যুগে আরবের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর ও অশিক্ষিত থাকলেও সাহিত্যের প্রতি তাদের খুব অনুরাগ ছিল। তাদের অনেকেই মুখে মুখে গীতিকবিতা চর্চা করত। তৎকালীন আরবে উকায মেলা নামে বাৎসরিক একটি মেলা বসত। মেলায় তৎকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ কবিগণ তাদের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করত। যেসব কবিতা সেরা বিবেচিত হতো তা সোনালি বর্ণে লিখে পবিত্র কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। আরবি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ 'আস-সাবউল মুআল্লাকাত'

(সাতটি ঝুলন্ত গীতিকবিতা) জাহিলি যুগেই রচিত। কবিতা রচনার কারণে আরবরা জাহিলি যুগেই বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছিল। তাদের কবিতা মানের দিক থেকে ছিল খুব উন্নত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "যখন তোমরা আল্লাহর কিতাবের কোনো কিছু বুঝতে না পার তবে তার অর্থ আরবদের কবিতায় তালাশ কর। কারণ কবিতা তাদের জীবনালেখ্য।" (আল-মুফাচ্ছাল)

এতে বোঝা যায় প্রাচীন আরবের সাংস্কৃতিক জীবনে অসংখ্য প্রবাদ-প্রবচন, নানা কিংবদন্তি ও মুখরোচক কাহিনী এবং বাগ্মিতার প্রচলন ছিল, তবে তাদের সংস্কৃতি চর্চার প্রধান মাধ্যম ছিল কবিতা।

পাঠ ২

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জন্ম, শৈশব ও কৈশোর

জন্ম ও শৈশব

আরব যখন চরম জাহিলিয়াতে নিমজ্জিত তখন আরবের কুরাইশ বংশে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ। দাদার নাম আব্দুল মুত্তালিব। মাতার নাম আমিনা। নানার নাম ওয়াহাব। জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মদ। আর তাঁর মাতা নাম রাখেন আহমাদ।

জন্মের পর মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ধাত্রী মা হালিমার ঘরে লালিত-পালিত হন। হালিমা বনু সাদ গোত্রের লোক ছিলেন। আর বনু সাদ গোত্র বিশুদ্ধ আরবিতে কথা বলত। ফলে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)ও বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় কথা বলতেন। শৈশবকাল থেকে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মাঝে ন্যায় ও ইনসাফের নজির দেখা যায়। তিনি ধাত্রী হালিমার একটি স্তন পান করতেন অন্যটি তাঁর দুধভাই আব্দুল্লাহর জন্য রেখে দিতেন।

হালিমা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে পাঁচ বছর লালন-পালন করে তাঁর মা আমিনার নিকট রেখে যান। তাঁর বয়স যখন ছয় বছর তখন তাঁর মাতা ইন্তিকাল করেন। প্রিয়নবি (স.) অসহায় হয়ে পড়লে তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব নেন দাদা আব্দুল মুত্তালিব। আর আট বছর বয়সে তাঁর দাদাও মারা যান। এরপর লালন-পালনের দায়িত্ব নেন চাচা আবু তালিব।

কৈশোর

চাচা আবু তালিব অত্যন্ত আদর স্নেহ দিয়ে হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে লালন-পালন করতে থাকেন। আবু তালিবের আর্থিক অবস্থা ছিল অসচ্ছল। হযরত মুহাম্মদ (স.) এ অবস্থা অবলোকন করে চাচার সহযোগিতায় কাজ করা শুরু করেন। তিনি মেষ চরাতেন। মেষপালক রাখাল বালকদের জন্য তিনি ছিলেন উত্তম আদর্শ। তাদের সাথে তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতেন। কখনোই তাদের সাথে কলহ বা ঝগড়া-বিবাদ করতেন না। তিনি ১২ বছর বয়সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে চাচার সঙ্গে সিরিয়া যান। যাত্রা পথে 'বুহায়রা' নামক এক পাদ্রির সাথে দেখা হলে বুহায়রা মুহাম্মদকে অসাধারণ বালক বলে উল্লেখ করেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন যে, 'এ বালকই হবে শেষ যামানার আখেরি নবি (শেষ নবি)।'

শৈশবকাল থেকেই মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সত্যবাদী ও শান্তিকামী। সিরিয়া থেকে ফিরে এসে তিনি ফিজার যুদ্ধের বিভীষিকা দেখলেন। যুদ্ধটি শুরু হলো নিষিদ্ধ মাসে। তা ছাড়া কায়স গোত্র অন্যায়ভাবে কুরাইশদের উপর এ যুদ্ধ

চাপিয়ে দিয়েছিল। এ জন্য একে 'হারবুল ফিজ্জার' বা অন্যায় যুদ্ধ বলা হয়। পাঁচ বছর যাবৎ এ যুদ্ধ স্থায়ী হয়। হযরত মুহাম্মদ (স.) এ যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেননি। তবে যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ যুদ্ধে বহু মানুষ আহত ও নিহত হয়। তাতে তাঁর কোমল হৃদয় কেঁদে উঠে। আহতদের আর্তনাদ শুনে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। শান্তিকামী মানুষ হিসেবে এ অশান্তি তাঁর সহ্য হলো না। তাই তিনি আরবের শান্তিকামী যুবকদের নিয়ে 'হিলফুল ফুযুল' (শান্তি সংঘ) গঠন করলেন। এই সংঘের উদ্দেশ্য ছিল আর্তের সেবা, অত্যাচারীকে প্রতিরোধ ও অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং গোত্রে গোত্রে শান্তি, সম্প্রীতি বজায় রাখা। বর্তমান আধুনিক বিশ্বের জাতিসংঘ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শান্তিসংঘ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ঐ হিলফুল ফুযুলের কাছে অনেকাংশে ঋণী। তারাও হিলফুল ফুযুলের মতো যুদ্ধ বন্ধ করে সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি– আমানতদারি, সত্যবাদিতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার কারণে তৎকালীন আরবের লোকজন তাঁকে আল-আমিন (বিশ্বাসী) উপাধি দিয়েছিল। নবুয়ত প্রাপ্তির পর যারা তাঁকে অস্বীকার করেছিল তারাও তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে পারেনি।

পাঠ ৩

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর যৌবনকাল, নবুয়ত প্রাপ্তি ও ইসলাম প্রচার

যৌবনকাল

যুবক মুহাম্মদ (স.)-এর সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও চারিত্রিক গুণাবলির সংবাদ মক্কার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তখনকার আরবের শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী বিদুষী ও বিধবা মহিলা হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর ব্যবসার দায়িত্ব হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর অর্পণ করেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর ব্যবসায়িক কাজে সিরিয়া যান। তিনি এ ব্যবসায় আশাতীত লাভবান হয়ে দেশে ফিরে আসেন। যুবক হয়েও খাদিজা (রা.)-এর ব্যবসায় হযরত মুহাম্মদ (স.) যে দায়িত্বশীলতা ও সততার পরিচয় দিয়েছিলেন তা সর্বকালে সকল যুবকের জন্য আদর্শ। খাদিজা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর গুণাবলি পর্যবেক্ষণ করার জন্য তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী 'মাইসারা'কে মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে সিরিয়া পাঠান। মাইসারা সিরিয়া থেকে ফিরে এসে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলির বর্ণনা খাদিজা (রা.)-কে দেন। তাতে মুগ্ধ হয়ে খাদিজা নিজেই হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নিকট তাঁর বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। চাচা আবু তালিবের অনুমতি নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (স.) খাদিজাকে বিবাহ করেন। এ সময় হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বয়স ছিল পঁচিশ বছর। আর খাদিজা (রা.)-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। বিবাহের পর খাদিজার আন্তরিকতায় ও সৌজন্যে হযরত মুহাম্মদ (স.) প্রচুর সম্পদের মালিক হন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স.) এ সম্পদ নিজের ভোগ-বিলাসে ব্যয় না করে অসহায়, দুঃখী, পীড়িত ও গরিব-মিসকিনদের সেবায় ব্যয় করেন।

আজকের সমাজে আমরা যদি মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ন্যায় আর্তমানবতার সেবায় সম্পদ ব্যয় করি, তাহলে সমাজের দুঃস্থ, অসহায় ও গরিব-দুঃখীদের কষ্ট লাঘব হবে, সমাজে শান্তি বিরাজ করবে।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর তখন কাবা শরিফ পুনর্নির্মাণ করা হয়। হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) স্থাপন নিয়ে আরবের বিভিন্ন গোত্রে বিরোধ দেখা দেয়। সবাই হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের গৌরব অর্জন করতে চায়। তাতে কেউ ছাড় দিতে রাজি নয়। ফলে গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার উপক্রম হয়। অতঃপর সকলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, পরের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি কাবা ঘরে প্রবেশ করবে তার ফয়সালা মেনে নেওয়া হবে। দেখা গেল পরের দিন সকলের আগে হযরত মুহাম্মদ (স.) কাবা ঘরে প্রবেশ করলেন। সবাই এক বাক্যে বলে উঠল,

এই এসেছেন আল-আমিন, আমরা তাঁর প্রতি আস্থাশীল ও সন্তুষ্ট। হযরত মুহাম্মদ (স.) অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও নিরপেক্ষতার সাথে যে ফয়সালা দিলেন, সকলে তা নির্দ্বিধায় মেনে নিল। ফলে তারা অনিবার্য রক্তপাত থেকে মুক্তি পেল। এভাবে বর্তমান সময়েও বিচক্ষণতা ও নিরপেক্ষতার সাথে বিচারকার্য পরিচালনা করলে দেশে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। জাতি অনেক অনিবার্য দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও রক্তপাত থেকে মুক্তি পাবে।

নবুয়ত প্রাপ্তি

হযরত খাদিজা (রা.)-এর সাথে বিবাহের পর হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কার অদূরে হেরা পর্বতের গুহায় গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। দীর্ঘদিন ধ্যানে মগ্ন থাকার পর ৪০ বছর বয়সে ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র রমযান মাসের কদরের রাতে হযরত জিবরাইল (আ.) তাঁর নিকট ওহি নিয়ে আসেন এবং তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হন। জিবরাইল বললেন, اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ অর্থ : "পড়ুন! আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আলাক, আয়াত ১)। উত্তরে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বললেন, আমি পড়তে জানি না। জিবরাইল (আ.) তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, পড়ুন! তিনি বললেন, আমি পড়তে জানি না। এভাবে তিনবার প্রিয়নবি (স.)-কে জড়িয়ে ধরলেন। অতঃপর তৃতীয়বারের সময় তিনি পড়তে সক্ষম হলেন। বাড়ি ফিরে হযরত মুহাম্মদ (স.) হযরত খাদিজা (রা.)-এর নিকট সব ঘটনা খুলে বললেন এবং জীবনের আশংকা করলেন। তখন হযরত খাদিজা (রা.) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন- না, কখনো না। আল্লাহর শপথ! তিনি আপনাকে কখনো অপদস্থ করবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, দুঃস্থ ও দুর্বলদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন, নিঃস্ব ও অভাবীদের উপার্জনক্ষম করেন। মেহমানদের সেবাযত্ন করেন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে (লোকদের) সাহায্য করেন।

এতে বোঝা যায় যে, নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও হযরত মুহাম্মদ (স.) কী রকম আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে মানবিক মহৎ গুণাবলি অনুশীলন করতেন এবং মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। আমাদের উচিত বাস্তবজীবনে মহানবির এসব আদর্শ অনুশীলন করা।

ইসলাম প্রচার

নবুয়ত প্রাপ্তির পর মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বিপথগামী মক্কাবাসীর নিকট ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসুল। তিনি আরও ঘোষণা করেন, ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম, আল-কুরআন এ ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ। আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, নিয়ামক এবং সবকিছুর মালিক। তিনি সকল সৃষ্টির জীবন ও মৃত্যুদানকারী।

প্রথম তিন বছর তিনি গোপনে তাঁর আত্মীয়স্বজনকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। পরে আল্লাহর নির্দেশে প্রকাশ্যে ইসলামের পথে দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন। এতে মূর্তি পূজারিরা তাঁর বিরোধিতা করতে শুরু করল। নবিকে তারা ধর্মদ্রোহী, পাগল বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল। তারা তাঁর উপর শারীরিক, মানসিক নির্যাতন চালাল, পাথর ছুড়ে আঘাত করল, আবর্জনা নিক্ষেপ করল, অপমানিত ও লাঞ্ছিত করল। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে নেতৃত্ব, ধন-সম্পদ ও সুন্দরী নারীর লোভ দেখাল। তিনি বললেন, আমার এক হাতে চন্দ্র আর অন্য হাতে সূর্য এনে দিলেও আমি এ সত্য প্রচার করা থেকে বিরত হব না। সত্য প্রচারে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) যে আত্মত্যাগ, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন তা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদেরও সত্য ও ন্যায়ের পথে আত্মত্যাগী, দৃঢ়সংযমী, ধৈর্যশীল ও কষ্ট-সহিষ্ণু হওয়া উচিত।

পাঠ ৪

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মাদানি জীবন

মক্কার কাফিররা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে ইসলাম প্রচার থেকে বিরত রাখতে না পেরে তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে হযরত মুহাম্মদ (স.) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরত করলেন। মক্কার তুলনায় মদিনায় শান্ত ও নির্মল পরিবেশে এসে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) গুরুত্বপূর্ণ অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করলেন, আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মাঝে চলমান দীর্ঘ দিনের যুদ্ধ বন্ধ করলেন। মুহাজির (ইসলামের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতকারী) ও আনসারদের (মুহাজিরদেরকে সার্বিকভাবে সাহায্যকারী মদিনাবাসী) মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও সৌহার্দ স্থাপন করলেন। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হলো। গড়ে তুললেন ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা। সকল মুসলিমের মিলনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুললেন মসজিদে নববি।

মদিনা সনদ

মদিনা ছিল বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের লোকজনের আবাস। হযরত মুহাম্মদ (স.) এই সকল জাতিকে এক করে সেখানে একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা নিলেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি সকল গোত্রের নেতাদের সাথে বৈঠক করে একটি লিখিত সনদ প্রণয়ন করেন, যা ইসলামের ইতিহাসে 'মদিনা সনদ' নামে খ্যাত। এই সনদে মোট ৪৭টি ধারা ছিল। তার মধ্যে প্রধান ধারাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. সনদে স্বাক্ষরকারী মুসলমান, ইহুদি, খ্রিষ্টান ও পৌত্তলিক সম্প্রদায়সমূহ সমানভাবে নাগরিক অধিকার ভোগ করবে।

২. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) হবেন প্রজাতন্ত্রের প্রধান এবং সর্বোচ্চ বিচারালয়ের কর্তা।

৩. মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে।

৪. কেউ কুরাইশ বা অন্য কোনো বহিঃশত্রুর সাথে মদিনাবাসীর বিরুদ্ধে কোনোরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারবে না।

৫. স্বাক্ষরকারী কোনো সম্প্রদায় বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে সকল সম্প্রদায়ের সমবেত প্রচেষ্টায় তা প্রতিহত করা হবে।

৬. বহিঃশত্রু কর্তৃক মদিনা আক্রান্ত হলে সকলে সম্মিলিতভাবে শত্রুর মোকাবিলা করবে এবং প্রত্যেকে স্ব-স্ব গোত্রের যুদ্ধভার বহন করবে।

৭. কোনো ব্যক্তি অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হবে। তার অপরাধের জন্য গোটা সম্প্রদায়কে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না।

৮. মদিনা পবিত্র নগরী বলে ঘোষণা করা হলো। এখন থেকে এই শহরে রক্তপাত, হত্যা, ব্যভিচার এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলো।

৯. ইহুদি সম্প্রদায়ের মিত্ররাও সমান স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা ভোগ করবে।

১০. হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর অনুমতি ব্যতীত মদিনার কোনো গোত্র কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।

১১. স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে কখনো বিরোধ দেখা দিলে হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তা মীমাংসা করবেন।

১২. সনদের ধারা ভঙ্গকারীর উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

এই মদিনা সনদ হলো মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান, যার মাধ্যমে ইসলাম ও মহানবি (স.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠেছে।

আমাদের উচিত রাষ্ট্রের কল্যাণে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করে সুন্দর সমৃদ্ধ গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করা।

পাঠ ৫

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মক্কা বিজয় ও বিদায় হজ

মক্কা বিজয়

অনুকূল পরিবেশ পাওয়ায় মদিনায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার খুব দ্রুত ঘটতে লাগল। ষষ্ঠ হিজরিতে মক্কার কুরাইশরা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ও মুসলমানদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি করে। কুরাইশরা সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করলে রাসুল (স.) ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে ১০০০০ (দশ হাজার) মুসলিম নিয়ে মক্কা অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন। মক্কার অদূরে হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁবু স্থাপন করেন। কুরাইশরা মুসলিমদের এই বাহিনী দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হলো। তারা কোনো প্রকার বাধা দেওয়ার সাহস করল না। বিনা রক্তপাতে ও বিনা বাধায় মুসলিম বাহিনী মক্কা বিজয় করল। মক্কা বিজয়ের পর মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। বললেন-

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اِذْهَبُوْا فَاَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ

অর্থ : "আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই, যাও তোমরা মুক্ত ও স্বাধীন।"

সে সময়ে তিনি ইসলামের চরম শত্রু আবু সুফিয়ানসহ সকলকে হাতের নাগালে পেয়েও যেভাবে ক্ষমা করে দিয়েছেন মানবতার ইতিহাসে তা বিরল। ভুল বুঝতে পারার পর আমাদের শত্রুরা অনুতপ্ত হলে আমরাও তাদের বিনা শর্তে ক্ষমা করে দেব। ক্ষমা একটি মহৎ গুণ।

বিদায় হজ ও এর ভাষণ

মক্কা বিজয়ের পর দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। আরবের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইসলাম পৌঁছে গেল। হযরত মুহাম্মদ (স.) বুঝলেন আর বেশিদিন পৃথিবীতে তাঁর থাকা হবে না। তাই তিনি ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে (দশম হিজরিতে) হজ করার ইচ্ছা করলেন। এ উদ্দেশ্যে উক্ত সালের ফেব্রুয়ারি (যিলকদ) মাসে লক্ষাধিক সাহাবি নিয়ে হজ করতে গেলেন, যা বিদায় হজ নামে পরিচিত। এ হজে রাসুল (স.)-এর সহধর্মিণীগণও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। যুল হুলাইফা নামক স্থানে এসে সকলে ইহরাম (হজের পোশাক) বেঁধে বাইতুল্লাহর উদ্দেশে রওনা হন। জিলহজ মাসের নবম তারিখে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত জনসমুদ্রের উদ্দেশে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এক যুগান্তকারী ভাষণ দেন। এ ভাষণে বিশ্ব মানবতার সকল কিছুর দিকনির্দেশনা ছিল। আরাফাতের ময়দানের পার্শ্বে 'জাবালে রহমত' নামক পাহাড়ে উঠে মহানবি (স.) প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। অতঃপর বললেন-

১. হে মানব সকল! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনবে। কারণ আগামী বছর আমি তোমাদের সাথে এখানে সমবেত হতে পারব কিনা জানি না।

২. আজকের এ দিন, এ স্থান, এ মাস যেমন পবিত্র, তেমনই তোমাদের জীবন ও সম্পদ পরস্পরের নিকট পবিত্র।

৩. মনে রাখবে অবশ্যই একদিন সকলকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে। সেদিন সকলকে নিজ নিজ কাজের হিসাব দিতে হবে।

৪. হে বিশ্বাসীগণ! স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে। তাদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে তেমনই তোমাদের উপরও তাদের অধিকার রয়েছে।

৫. সর্বদা অন্যের আমানত রক্ষা করবে এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে ও সুদ খাবে না।

৬. আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না। আর অন্যায়ভাবে একে অন্যকে হত্যা করবে না।

৭. মনে রেখ! দেশ, বর্ণ-গোত্র, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মুসলমান সমান। আজ থেকে বংশগত শ্রেষ্ঠত্ব বিলুপ্ত হলো। শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি হলো আল্লাহভীতি ও সৎকর্ম। সে ব্যক্তিই সবচাইতে সেরা, যে নিজের সৎকর্ম দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।

৮. ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না; পূর্বের অনেক জাতি একারণেই ধ্বংস হয়েছে। নিজ যোগ্যতা বলে ক্রীতদাস যদি নেতা হয় তার অবাধ্য হবে না। বরং তার আনুগত্য করবে।

৯. দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। তোমরা যা আহার করবে ও পরিধান করবে তাদেরকেও তা আহার করাবে ও পরিধান করাবে। তারা যদি কোনো অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলে, তবে তাদের মুক্ত করে দেবে, তবুও তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে না। কেননা তারাও তোমাদের মতোই মানুষ, আল্লাহর সৃষ্টি। সকল মুসলিম একে অন্যের ভাই এবং তোমরা একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।

১০. জাহিলি যুগের সকল কুসংস্কার ও হত্যার প্রতিশোধ বাতিল করা হলো। তোমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর বাণী এবং তাঁর রাসুলের আদর্শ রেখে যাচ্ছি। এগুলো যতদিন তোমরা আঁকড়ে থাকবে ততদিন তোমরা বিপথগামী হবে না।

১১. আমিই শেষ নবি। আমার পর কোনো নবি আসবে না।

১২. তোমরা যারা উপস্থিত আছ তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দেবে।

তারপর হযরত মুহাম্মদ (স.) আকাশের দিকে তাকিয়ে আওয়াজ করে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমি কি তোমার বাণী সঠিকভাবে জনগণের নিকট পৌঁছাতে পেরেছি? সাথে সাথে উপস্থিত জনসমুদ্র থেকে আওয়াজ এলো, হ্যাঁ। নিশ্চয়ই পেরেছেন। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (স.) বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। এরপরই আল্লাহ তায়ালা নাজিল করলেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

অর্থ : "আজ আমি তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামত তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম। ইসলামকে তোমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৩)

মহানবি (স.) কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। উপস্থিত জনতাও নীরব থাকল। অতঃপর সকলের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'আল-বিদা' (বিদায়)। একটা অজানা বিয়োগ-ব্যথা উপস্থিত সকলের অন্তরকে ভারাক্রান্ত করে তুলল।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর ভাষণের মাধ্যমে যে দিকনির্দেশনা তুলে ধরেছিলেন বাস্তব জীবনে তিনি তা অনুশীলন

করেছেন। আমরাও আমাদের ভাষণে বা বক্তব্যে যা বলব বাস্তব জীবনে তা অনুশীলন করব। তাহলে আমাদের দেশ ও জাতি আরও সুন্দর, সমৃদ্ধ ও উন্নত হবে।

> **কাজ :** 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় মদিনা সনদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে' ক্লাসে বসে শিক্ষার্থীরা এর উপর দশটি বাক্য তৈরি করবে।

পাঠ ৬

খুলাফায়ে রাশেদিনের জীবনাদর্শ

খুলাফায়ে রাশেদিন বলতে ইসলামের প্রথম চারজন খলিফাকে বোঝায়। তাঁরা হলেন- হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলি (রা.)। তাঁরা সকলেই মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) থেকে সরাসরি ইসলামের শিক্ষা লাভ করেছেন। বাস্তব জীবনে তা যথাযথভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করেছেন। তাই তাঁদের জীবনকর্ম আমাদের আদর্শ।

হযরত আবু বকর (রা.)

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের তায়িম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম আব্দুল্লাহ এবং তাঁর উপাধি সিদ্দিক ও আতিক। ছোটকাল থেকেই মহানবি (স.)-এর সাথে তাঁর ছিল গভীর বন্ধুত্ব। বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম কবুল করেন। সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে সর্বদা তিনি মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে থাকতেন।

তাবুক যুদ্ধের সময় তিনি তাঁর সমুদয় সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেন। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় এরূপ সর্বস্ব ব্যয়ের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি হযরত আবু বকর (রা.)-এর ছিল অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা। তিনি রাসুলুল্লাহ (স.)-এর মুখে মি'রাজের ঘটনা শোনামাত্র নিঃসন্দেহে তা বিশ্বাস করেন। তাই তাঁকে সিদ্দিক (মহাসত্যবাদী) উপাধি দেওয়া হয়েছিল।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তিকালের পর খলিফা নির্বাচন, রাসুলুল্লাহ (স.)-এর ওফাতের পর দাফন ও রাসুলের উত্তরাধিকারীর বিষয়ে তাঁর থেকে বর্ণিত হাদিস দ্বারা সমাধা হয়। ফলে মুসলমানগণ এক অবশ্যম্ভাবী বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা পান। খলিফা নির্বাচিত হয়ে তিনি জনতার উদ্দেশে বললেন, "যতদিন আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.)-এর অনুসরণ করি ততদিন তোমরা আমার অনুসরণ করবে এবং আমাকে সাহায্য করবে। আর ভুল পথে চললে তোমরা আমাকে সাথে সাথে সংশোধন করে দেবে। তোমাদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদের হক আদায় না করা পর্যন্ত তারা আমার নিকট শক্তিশালী। আর যারা সবল তাদের নিকট থেকে পাওনাদারের হক আদায় না করা পর্যন্ত তারা আমার নিকট দুর্বল।"

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর শাসন সর্বকালের শাসকদের জন্য আদর্শ। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তিকালের পর মুসলিম রাষ্ট্রে কতিপয় সমস্যা দেখা দেয়। কেউ কেউ মিথ্যা নবুয়তের দাবি করে, কতিপয় লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করে, আবার কতিপয় লোক ইসলাম ত্যাগ করে। হযরত আবু বকর (রা.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এসব মোকাবিলা করেন, ইসলাম ও মুসলমানদের বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করেন। আমাদেরও উচিত হযরত আবু বকর (রা.)-এর মতো অত্যন্ত দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার সাথে শাসনকাজ পরিচালনা করে দেশ ও জাতিকে বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রক্ষা করা।

আল-কুরআন সংরক্ষণ

ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের অনেক হাফিয শাহাদাতবরণ করেন। এতে কুরআন বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দিলে তিনি পবিত্র কুরআনকে একত্র করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এসব যুগান্তকারী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করার কারণে তাঁকে ইসলামের 'ত্রাণকর্তা' বলা হয়।

খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পরও হযরত আবু বকর (রা.) ব্যবসা করতেন। নিজ হাতের উপার্জন খেতেন। পরবর্তীতে মুসলমানদের দাবির মুখে তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সামান্যমাত্র ভাতা নিতেন। মুসলিম জাহানের খলিফা হয়েও হযরত আবু বকর (রা.) রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রে যে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, তা সকল রাজা-বাদশাহ ও রাষ্ট্র-প্রধানের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেশ করবে।

পাঠ ৭

হযরত উমর (রা.)

মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.) ৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে আরবের মক্কা নগরীতে কুরাইশ বংশের আদি গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খাত্তাব। মাতার নাম হানতামা। তিনি ছিলেন শিক্ষিত, মার্জিত ও সৎ চরিত্রের অধিকারী। যুবক বয়সে নামকরা কুস্তিগির, সাহসী যোদ্ধা, কবি ও সুবক্তা ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ

হযরত উমর ফারুক (রা.) প্রথম দিকে ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন। একদা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে হত্যার জন্য তিনি খোলা তরবারি হাতে নিয়ে বের হলেন। পথে শুনলেন যে, তাঁর বোন ফাতিমা ও ভগ্নিপতি সাঈদ মুসলমান হয়ে গেছেন। তিনি তাঁদের হত্যা করার জন্য তাঁদের বাড়ি যান। তাঁদের উপর অনেক অত্যাচার চালান। তাঁদের ইসলাম ত্যাগ করতে বলেন, কিন্তু তাঁরা প্রাণের বিনিময়েও ইসলাম ত্যাগ করতে চাইলেন না। তাঁদের অনড় অবস্থা দেখে তাঁর ভাবান্তর ঘটল। তিনি মুসলমান হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তিনি মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দরবারে গিয়ে নিজের তরবারিটি মহানবি (স.)-এর পায়ের কাছে রেখে মুসলমান হয়ে গেলেন। হযরত উমর ফারুক (রা.) মহানবিকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনি যে দাওয়াত দিচ্ছেন তা কি সত্য? মহানবি (স.) বললেন, হ্যাঁ। তখন হযরত উমর (রা.) বললেন- তাহলে আর গোপন নয়, এখন থেকে আমরা প্রকাশ্যে কাবা ঘরের সামনে সালাত আদায় করব। মহানবি অত্যন্ত খুশি হয়ে তাঁকে 'ফারুক' (সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী) উপাধি দিলেন। তিনি নবুয়তের ষষ্ঠ বছরে ৩৩ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত উমর ফারুক (রা.) ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তিনি ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য স্বীয় ধন-সম্পদ অকাতরে ব্যয় করেন। তাবুক অভিযানে হযরত উমর ফারুক (রা.) তাঁর সমুদয় সম্পদের অর্ধেক আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন। হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর ন্যায় সাহসী হয়ে আমরাও সত্য পথে চলব ও সত্য কথা বলব।

ন্যায়বিচারক

হযরত উমর ফারুক (রা.) ছিলেন ন্যায় ও ইনসাফের এক মূর্ত প্রতীক। আইনের চোখে তিনি ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু, আপন-পরের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করতেন না। মদ্যপানের অপরাধে স্বীয় পুত্র আবু শাহমাকে তিনি অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা.) ছিলেন গণতন্ত্রমনা। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং তাঁদের মতামতের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন।

চরিত্র

হযরত উমর ফারুক (রা.) ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর মানবীয় গুণটি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠে। তিনি সত্য ও অসত্যের বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ থাকতেন। তিনি রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীর খোঁজ-খবর রাখার জন্য পুলিশ বিভাগ ও গোয়েন্দা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। সেনাবাহিনীকে সুশৃঙ্খল করার জন্য প্রতি চার মাস পর বাধ্যতামূলক ছুটির ব্যবস্থা করেন। কৃষি কাজের উন্নয়নে খাল খননের ব্যবস্থা করেন। জনসাধারণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য তিনি রাতের অন্ধকারে পাড়া-মহল্লায় ঘুরে বেড়াতেন। ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে নিজ কাঁধে করে আটার বস্তা নিয়ে তিনি তাঁবুতে দিয়ে আসেন। স্বীয় স্ত্রী উম্মে কুলসুমকে, প্রসব বেদনায় কাতর এক বেদুইনের স্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য তার ঘরে নিয়ে যান। পৃথিবীর রাজা বাদশাহদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এমন প্রজাবৎসল শাসক আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মানব দরদি হযরত উমর ফারুক (রা.) ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ। জুমুআর সময় তিনি জনসাধারণের জন্য শাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার ব্যবস্থা করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এক লোক স্বয়ং তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, বাইতুলমাল থেকে প্রাপ্ত কাপড় দিয়ে কারও পুরো একটি জামা হয়নি। অথচ খলিফার গায়ে সে কাপড়ের একটি পুরো জামা দেখা যাচ্ছে। খলিফা অতিরিক্ত কাপড় কোথায় পেলেন? খলিফার পক্ষ থেকে তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ (রা.) উত্তর দিলেন যে, আমি আমার অংশটুকু আমার আব্বাকে দিয়ে দিয়েছি, এতে তাঁর পুরো জামা হয়েছে।

আমাদের দেশেও যদি শাসনকার্যে জবাবদিহি নিশ্চিত করা যায় তাহলে আমাদের শাসনকাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণও হযরত উমরের মতো ন্যায়পরায়ণ হবেন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতায় হযরত উমরের অবস্থানের উপর দশটি বাক্য তৈরি করবে।

পাঠ ৮

হযরত উসমান (রা.)

মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলিফা ছিলেন হযরত উসমান (রা.)। তিনি ৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও লজ্জাশীল ছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষায়ও ছিলেন স্বনামধন্য। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর দু'কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে (একজনের মৃত্যুর পর আরেকজনকে) তাঁর সাথে বিবাহ দেন। এ কারণে তাঁকে যুননুরাইন (দুই জ্যোতির অধিকারী) বলা হয়।

তিনি ৩৪ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাঁর চাচা হাকাম তাঁকে নানা রকম নির্যাতন করে। সব নির্যাতন তিনি সহ্য করেন। আত্মীয়দের নির্যাতন অসহ্য পর্যায়ে পৌঁছালে তিনি মহানবি (স.)-এর কন্যা ও স্বীয় সহধর্মিণী রুকাইয়াকে নিয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।

ইসলামের খেদমত

হযরত উসমান (রা.) ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী। ব্যবসা করে এসব ধন-সম্পদ অর্জন করেন। যার কারণে তাঁকে গনি (ধনী) বলা হতো। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইসলাম ও মানবতার সেবায় অকাতরে তাঁর সম্পদ ব্যয় করেন। মদিনার অধিবাসীদের পানির অভাব দূর করার জন্য তিনি ১৮০০০ (আঠার হাজার) দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ব্যয় করে একটি কূপ ক্রয় করে তা ওয়াকফ্ করে দেন। মদিনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি মদিনাবাসীদের মাঝে ত্রাণ হিসেবে খাবার বিতরণ করেন। মসজিদে নববিতে মুসল্লিদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত খরচে মসজিদ সম্প্রসারণ করেন। তাবুক যুদ্ধের ৩০০০০ (ত্রিশ হাজার) সৈন্যের এক তৃতীয়াংশ তথা দশ হাজার সৈন্যের ব্যয়ভার তিনি গ্রহণ করেন। রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে শক্তিশালী করতে তিনি একাই এক হাজার উট দান করেন। এ ছাড়াও তিনি সাতটি ঘোড়া ও এক হাজার দিনার মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দরবারে দান করেন।

হযরত উসমান (রা.)-কে আল্লাহ্ যেমন প্রচুর সম্পদ দান করেছেন তেমনি তিনি তা অকাতরে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সর্বকালের সম্পদশালী লোকদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ।

কুরআন সংকলন

আরবের বিভিন্ন এলাকার লোকজন বিভিন্ন উপভাষায় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করত। হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে মুসলিম সাম্রাজ্যের আরও বিস্তৃতি ঘটে। এতে কুরআন তিলাওয়াত নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। ফলে মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। হযরত উসমান (রা.) এ অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি উম্মুল মু'মিনিন হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত পবিত্র কুরআনের মূল কপি সংগ্রহ করেন। হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.)-কে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করে দেন। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.), হযরত সাঈদ ইবনে আল-আস (রা.) ও হযরত আব্দুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশাম (রা.)। হিজরি ৩০ মোতাবেক ৬৫১ খ্রি. তাঁরা হযরত হাফসা (রা.) থেকে সংগৃহীত কপির আলোকে আরও ৭টি কপি তৈরি করেন এবং তা মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। একে 'মাসহাফে উসমানি' বলা হয়। ফলে সারাবিশ্বে একটি রীতিতে কুরআন তিলাওয়াত আরম্ভ হয়। এজন্য তাঁকে 'জামিউল কুরআন' (কুরআন একত্রকারী বা কুরআন সংকলক) বলা হয়। বিশ্বে বর্তমানে প্রচলিত কপিগুলোও মাসহাফে উসমানির প্রতিলিপি।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কুরআন সংকলনে হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের উপর একটি টীকা তৈরি করবে।

পাঠ ৯

হযরত আলি (রা.)

হযরত আলি (রা.) ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা। তিনি ৬০০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার কুরাইশ বংশের বনু হাশিম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর চাচা আবু তালিবের পুত্র ছিলেন। তাঁর ডাকনাম ছিল আবু তোরাব ও আবুল হাসান। বাল্যকাল থেকেই তিনি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে থাকতেন। মহানবি (স.)-এর প্রতি

তাঁর অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। তাই দশ বছর বয়সেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। বালকদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবি।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) হিজরত করে মদিনা যাওয়ার সময় হযরত আলি (রা.)-কে আমানতের মালের দায়িত্ব দিয়ে তাঁর বিছানায় রেখে যান। জীবনের কঠিন ঝুঁকি সত্ত্বেও তিনি এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। মহানবি (স.)-এর দেওয়া দায়িত্বের চেয়ে তিনি তাঁর জীবনের মূল্য তুচ্ছ মনে করেছেন। দায়িত্ব পালনই ছিল তাঁর কাছে বড় ব্যাপার। হযরত আলি (রা.)-এর মতো সত্যের পথে জীবনবাজি রাখা যুবক খুব কম আছে। আমরাও সত্যের পথে একনিষ্ঠ থাকব এবং সত্য প্রতিষ্ঠা করব।

বীরত্ব

হযরত আলি (রা.) ছিলেন শৌর্য-বীর্য ও অসাধারণ শক্তির অধিকারী। তাঁর নাম শুনলে কাফিরদের মনে ত্রাস সৃষ্টি হতো। বদর যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের জন্য রাসুল (স.) তাঁকে 'যুলফিকার' তরবারি উপহার দেন। খায়বারে কামুস দুর্গ জয় করলে হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁকে 'আসাদুল্লাহ' (আল্লাহর সিংহ) উপাধি প্রদান করেন। হুদায়বিয়া সন্ধিপত্র তিনি নিজ হাতে লিখেছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় মুসলিম বাহিনীর পতাকা তাঁর হাতে ছিল।

জ্ঞান সাধনা

হযরত আলি (রা.) অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন। ছোট বেলা থেকেই তিনি ছিলেন জ্ঞান তাপস ও জ্ঞান সাধক। তিনি সর্বদা জ্ঞানচর্চা করতেন। হাদিস, তাফসির, আরবি সাহিত্য ও আরবি ব্যাকরণে তিনি তাঁর যুগের সেরা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কথিত আছে যে, 'হযরত মুহাম্মদ (স.) হলেন জ্ঞানের শহর, আর আলি হলেন তার দরজা'। তাঁর রচিত 'দিওয়ানে আলি' নামক কাব্য গ্রন্থটি আরবি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। আমরাও সর্বদা হযরত আলি (রা.)-এর মতো জ্ঞান সাধনা করব।

অনাড়ম্বর জীবনযাপন

হযরত আলি (রা.) সারা জীবন জ্ঞান সাধনায় ব্যস্ত থাকায় সম্পদ উপার্জন করার সময় পাননি। তিনি অনাড়ম্বর ও সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন। নিজ হাতে কাজ করে উপার্জন করতেন। কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কখনো না খেয়ে থাকতেন। তবুও আক্ষেপ করতেন না। বাসায় কোনো কাজের লোক ছিল না। তাঁর স্ত্রী রাসুলুল্লাহ (স.)-এর আদরের কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) নিজ হাতে জাঁতা পিষে গম গুঁড়ো করতেন ও রুটি তৈরি করতেন। মুসলিম জাহানের খলিফা হওয়ার পরও তিনি বাসায় কোনো কাজের লোক রাখেননি।

ইসলামের সেবা

তিনি আর্থিকভাবে সচ্ছল না হওয়ায় ধন-সম্পদ দিয়ে ইসলামের উল্লেখযোগ্য সেবা করতে পারেননি। তবে তাঁর শৌর্য-বীর্য, সাহসিকতা ও লেখনীর মাধ্যমে তিনি ইসলামের অনেক সেবা করেছেন। সাহসিকতা, বীরত্ব, জ্ঞানচর্চা, আত্মসংযম ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনে হযরত আলি (রা.) আমাদের সকলের আদর্শ। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে আমরা অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা হযরত আলি (রা.)-এর জ্ঞান সাধনার উপর একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।

পাঠ ১০

মুসলিম মনীষী

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নিকট ওহির সূচনা হলো اِقْرَأْ 'ইকরা' (আপনি পড়ুন) শব্দ দিয়ে। এজন্য ইসলাম শিক্ষায় প্রশিক্ষণ, জ্ঞান ও জ্ঞানীদের অনেক মর্যাদার কথা রয়েছে। আল কুরআনকে বলা হয়েছে হাকিম (বিজ্ঞানময়)। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, "প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরজ।" (ইবনে মাজাহ)

শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কায় দারুল আরকাম নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মদিনায় হিজরতের পর মসজিদে নববির বারান্দায় ৭০ জন শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে 'সুফফা' নামে একটি শিক্ষায়তন গড়ে তোলেন। মক্কা বিজয়ের পর মসজিদে নববি জ্ঞানচর্চার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সেখানে সুদূর পারস্য, রোম, কুফা, বসরা, বাগদাদ, সিরিয়া ও মিসর থেকে শিক্ষার্থীরা এসে জ্ঞানের জন্য ভিড় জমাত।

জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বিস্তারের জন্য মহানবি (স.) তাঁর সাহাবিদের বিভিন্ন দেশে পাঠাতেন। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) -এর ইন্তিকালের পর তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকে আরও মহিমান্বিত করে তোলেন। জ্ঞানের প্রদীপ বিভিন্ন দেশে প্রজ্বলিত করেন। প্রতিষ্ঠা করেন অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পাঠাগার। আব্বাসি খলিফা মামুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাইতুল হিকমার মাধ্যমে পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষায় রচিত বইগুলো আরবিতে অনুবাদ করা হয়। শাসকদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ফলে ইতিহাস, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থ, রসায়ন ও গণিতশাস্ত্রে মুসলিম মনীষীগণ বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হন। ফলে মুসলিমগণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদানের কথা মানব ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। মুসলমানগণ হাদিস, তাফসির, ফিকাহ, ইতিহাস ও দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রেও অবিস্মরণীয় অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। হাদিস শাস্ত্রে ইমাম বুখারি (র.), ফিকাহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা (র.), দর্শনশাস্ত্রে ইমাম গাযালি (র.) ও তাফসির শাস্ত্রে ইমাম ইবনে জারির আত তাবারির (র.) অবদান সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

ইমাম বুখারি (র.)

ইমাম বুখারি (র.)-এর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবু আব্দুল্লাহ, পিতার নাম ইসমাইল, দাদার নাম ইবরাহিম। উপাধি 'আমিরুল মু'মিনুন ফিল হাদিস' (হাদিস বর্ণনায় মুমিনদের নেতা)। তিনি ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির লালন কেন্দ্র বুখারা নগরীতে ১৯৪ হিজরি ১৩ শাওয়াল, ৮১০ খ্রিষ্টাব্দের ২১ জুলাই, জুমুআবার জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। মায়ের স্নেহ ও ভালোবাসায় তিনি বড় হন।

জ্ঞানার্জন

বাল্যকাল থেকে জ্ঞানের প্রতি তাঁর ছিল প্রবল আগ্রহ। তিনি খুব তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। ফলে ছয় বছর বয়সেই পবিত্র কুরআন হিফজ (মুখস্থ) করে ফেলেন। দশ বছর বয়স থেকেই হাদিস মুখস্থ করা আরম্ভ করেন। ষোল বছর বয়সেই তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ও আল্লামা ওয়াকি-এর লেখা হাদিস গ্রন্থদ্বয় মুখস্থ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর মা ও ভাইসহ হজ করতে পবিত্র মক্কা নগরীতে গমন করেন। সেখানে তিনি হিজাযের মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদিস শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। একাধারে ছয় বছর হাদিস বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার পর তিনি হাদিস সংগ্রহ করার জন্য কুফা, বাগদাদ, বসরা, মিসর, সিরিয়া, আসকালান, হিমস, দামিশক ইত্যাদি স্থানে গমন করেন। তিনি লক্ষাধিক হাদিস সনদসহ মুখস্থ করেন। তিনি স্বাধীনচেতা ও আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন বিধায় কোনো রাজা-বাদশার দরবারে গমনাগমন করতেন না।

বুখারি শরিফ সংকলন

ইমাম বুখারি দীর্ঘ ষোল বছর সাধনা করে ৬ লক্ষ হাদিস থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ৭২৭৫টি হাদিস বুখারি শরিফে লিপিবদ্ধ করেন। প্রত্যেক হাদিস লিখার পূর্বে তিনি ওযু ও গোসল করে দুই রাকআত নফল নামায পড়তেন। অতঃপর ইস্তেখারা (স্বপ্নে কল্যাণকর বস্তু পাওয়ার আবেদন) করতেন। বিশুদ্ধ মনে হলে সেই হাদিস লিখতেন। হাদিসবিশারদ ও উলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, পৃথিবীতে আল-কুরআনের পর বুখারি শরিফই হলো সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ। এটি ছাড়াও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। জ্ঞান সাধনায় ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করলে যে স্মরণীয় ও বরণীয় হওয়া যায় ইমাম বুখারি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বুখারা ত্যাগ

ইমাম বুখারি দীর্ঘ সাধনা শেষে বুখারায় এলে তৎকালীন বাদশাহ খালিদ ইবনে আহমদের সাথে বিরোধ সৃষ্টি হয়। বাদশাহ ইমাম বুখারির ইলমে হাদিসের গভীর জ্ঞানের কথা শুনে তাঁর কাছ থেকে হাদিস শোনার জন্য তাঁকে রাজ দরবারে ডেকে পাঠালেন। ইমাম বুখারি বললেন, "আমি হাদিসকে রাজ দরবারে নিয়ে অপমান করতে চাই না। তার প্রয়োজন হলে সে আমার ঘরে বা মসজিদে আসুক।" অতঃপর বাদশাহ তাঁকে বুখারা ত্যাগে বাধ্য করলে তিনি সমরকন্দে চলে যান।

স্মৃতিশক্তি

ইমাম বুখারি ছিলেন অগাধ স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তিনি যা দেখতেন বা শুনতেন তা তাঁর মনে থাকত। তাঁর বয়স যখন এগার তখন 'দাখেলি' নামক এক মুহাদ্দিস তাঁর সামনে হাদিস বর্ণনায় ভুল করলে তিনি তা শুদ্ধ করে দেন। উপস্থিত সবাই ইমাম বুখারির মেধা দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন।

সমরকন্দের প্রসিদ্ধ চারশত হাদিসবিশারদ তাঁর হাদিস মুখস্থের পরীক্ষা নেন। তিনি তাতে অত্যন্ত সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হলে সবাই তাঁকে সে যামানার শ্রেষ্ঠ হাদিসবিশারদ হিসেবে স্বীকৃতি দেন। বর্ণিত আছে যে, তাঁর ৯০ হাজারের উপরে ছাত্র ছিল যারা তাঁর কাছে হাদিস শিখেছেন।

যারা জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বিতরণে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায় ইমাম বুখারি তাদের জন্য এক অনুসরণীয় আদর্শ।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে বুখারি শরিফ প্রণয়নে ইমাম বুখারির সাধনার একটি বিবরণ তৈরি করবে।

পাঠ ১১

ইমাম আবু হানিফা (র.)

ফিকাহ শাস্ত্রের জনক ইমাম আবু হানিফা (র.) ৮০ হিজরি ৬৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের কূফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম নুমান, উপনাম আবু হানিফা। তাঁর উপাধি হলো ইমাম আযম (বড় ইমাম)। পিতার নাম সাবিত। তিনি একজন তাবেঈ ছিলেন।

জ্ঞান সাধনা

ইমাম আবু হানিফা (র.) ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী। প্রাথমিক জীবনে তিনি ব্যবসায় মনোনিবেশ করতে চাইলেন।

কিন্তু কুফা নগরীর তৎকালীন আলেম-উলামার পরামর্শক্রমে তিনি জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করেন। সতের বছর বয়স থেকে জ্ঞান সাধনা আরম্ভ করলেও তিনি অতি অল্প দিনের মধ্যে হাদিস, তাফসির, ফিকাহ ইত্যাদি বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি তাঁর শিক্ষক হযরত হাম্মাদ (র.)-এর নিকট একাধারে দশ বছর ফিকাহ বিষয়ের জ্ঞানার্জন করেন। এতে বোঝা যায়, জ্ঞানার্জনের নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই। কঠিন সাধনা থাকলে যে কোনো সময় জ্ঞানার্জন করা সম্ভব।

ফিকাহশাস্ত্রে অবদান

তিনি ফিকাহশাস্ত্রের উদ্ভাবক ছিলেন। তিনি তাঁর চল্লিশজন ছাত্রের সমন্বয়ে 'ফিকাহ সম্পাদনা বোর্ড' গঠন করেন। এই বোর্ড দীর্ঘ বাইশ বছর কঠোর সাধনা করে ফিকাহকে একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র হিসেবে রূপ দান করেন। পরবর্তীতে তিনি বোর্ডের চল্লিশজন সদস্য হতে দশজনকে নিয়ে একটি বিশেষ বোর্ড গঠন করেন। ফিকাহশাস্ত্র প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এই বোর্ডের অবদান সবচেয়ে বেশি। কোনো মাসআলা (সমস্যা) এলেই এই বোর্ড তা নিয়ে গবেষণা করত এবং কুরআন ও হাদিসের আলোকে গবেষণা করে ফতোয়া (সমাধান) দিত। এভাবে কুতুবে হানাফিয়্যাতে (হানাফি মাযহাবের কিতাবসমূহ) ৮৩ হাজার মাসআলা ও সমাধান লিপিবদ্ধ করা হয়। তিনি হানাফি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে কঠিন বস্তুও যে সহজ করা যায় ইমাম আবু হানিফার 'ফিকাহ বোর্ড' এর প্রমাণ।

হাদিসশাস্ত্রে অবদান

ফিকাহশাস্ত্রে সর্বাধিক অবদান থাকার কারণে হাদিস শাস্ত্রে তাঁর অবদান তুলনামূলকভাবে কম মনে হয়। হাদিস শাস্ত্রে তিনি 'মুসনাদে ইমাম আবু হানিফা' নামে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন, যাতে ৫০০ হাদিস রয়েছে।

গুণাবলি

ইমাম আযম আবু হানিফা (র.) গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, আবিদ ও বুদ্ধিমান। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর ছাত্র ইয়াযিদ ইবনে হারুন বলেন, "আমি হাজার হাজার জ্ঞানী দেখেছি, তাঁদের বক্তব্য শুনেছি। তাঁদের মধ্যে পাঁচজনের মতো জ্ঞানী, খোদাভীরু ও ইলমে ফিকাহ-এ পারদর্শী কাউকে দেখিনি। তাঁদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা (র.) হচ্ছেন অন্যতম।" ইমাম শাফেয়ি (র.) বলেছেন, "মানুষ ফিকাহশাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মুখাপেক্ষী।"

ইমাম বুখারির প্রিয় শিক্ষক হযরত মক্কি ইবনে ইবরাহিম বলেন- "ইমাম আবু হানিফা তাঁর কথা ও কাজে সত্যনিষ্ঠ ছিলেন।" তিনি এত বেশি ইবাদত করতেন যা চিন্তা করাও কঠিন। তিনি একাধারে ত্রিশ বছর রোযা রেখেছেন। চল্লিশ বছর যাবৎ রাতে ঘুমাননি। তিনি প্রতি রমযানে ৬১ বার কুরআন মজিদ খতম করতেন। তিনি মোট ৫৫ বার হজ্জ করেন। তিনি এতই আল্লাহভীরু ছিলেন যে, কুফায় ছাগল চুরির কথা শুনার পর তিনি সাত বছর যাবৎ বাজার থেকে ছাগলের গোশত ক্রয় করেননি; এ ভয়ে যে এটি চুরিকৃত ঐ ছাগলের গোশত হতে পারে। তিনি বিনা পয়সায় জ্ঞান বিতরণ করতেন। কাপড় ব্যবসা করে জীবনযাপন করতেন। একদা কুফায় তিনি এক লোকের জানাযা পড়তে গেলেন। মাঠে প্রচণ্ড রোদ। সকলে বলল, দয়া করে আপনি ঐ বৃক্ষের ছায়াতলে দাঁড়ান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন বৃক্ষটি কার। বলা হলো এটি আপনার অমুক ছাত্রের বাবার। তিনি বললেন, আমি ঐ বৃক্ষের ছায়ায় যাব না। কেননা ঐ ছাত্র মনে করতে পারে যে আমি তাকে শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে তার বাবার বৃক্ষের ছায়াতলে দাঁড়িয়েছি। আদর্শ শিক্ষকের এক মহান দৃষ্টান্ত এটি।

বিচারকের দায়িত্ব পালনে অনীহা

তৎকালীন বাগদাদের খলিফা আল মানসুর ইমাম আবু হানিফা (র.)-কে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নিতে প্রস্তাব দিলে তিনি তা গ্রহণ করেননি। ফলে তাঁকে জেলখানায় আবদ্ধ করে রাখা হয়। বলা হয় যে, এই মহান মনীষী ১৫০ হিজরি ৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে খলিফার নির্দেশে প্রয়োগকৃত বিষক্রিয়ার প্রভাবে ইন্তিকাল করেন। সরকার কর্তৃক দেওয়া সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাখ্যান করে ইমাম আবু হানিফা নৈতিক ও দীনি ইলমের মর্যাদা সমুন্নত রেখেছেন। আমরাও জ্ঞানচর্চায় ও নৈতিক মূল্যবোধ সংরক্ষণে সচেষ্ট থাকব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ফিকাহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর অবদান সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।

পাঠ ১২

ইমাম গাযালি (র.)

ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ আল গাযালি (র.) ছিলেন মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও ইসলামি চিন্তাবিদ। তিনি ৪৫০ হিঃ ১০৫৮ খ্রিষ্টাব্দে 'তুস' নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবু হামিদ। পিতার নাম মুহাম্মদ আত্‌তুসি। তিনি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি সুফিবাদের উপর গুরুত্ব প্রদান করতেন। মানুষের আধ্যাত্মিক ও আত্মিক উন্নতির জন্য নৈতিক শিক্ষা যে কতখানি আবশ্যক তা তিনি তাঁর লেখনীতে তুলে ধরেন। তিনি ইসলামি দর্শন ও সুফিবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অনেক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ইহইয়াউ উলুমিদ্ দীন' (ধর্মীয় বিজ্ঞানের পুনর্জীবন)। প্রামাণ্য ও যুক্তিপূর্ণ দলিলের মাধ্যমে তিনি ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামি দর্শন ও শিক্ষায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' (ইসলামের দলিল) নামে অভিহিত করা হয়। তিনি ১১১১ খ্রি. ইন্তিকাল করেন। যাঁরা আধ্যাত্মিক ও আত্মিক উন্নতি করতে চান, ইমাম গাযালি তাঁদের জন্য আদর্শ।

ইবনে জারির আত-তাবারি (র.)

তাঁর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবু জাফর, পিতার নাম জারির। তিনি ৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তাবারিস্তানের আমুল নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। সাত বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআন মুখস্থ করে ফেলেন। তিনি একজন প্রখ্যাত মুফাসসির, আরব ঐতিহাসিক ও ইমাম ছিলেন। তিনি পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ তাফসির (ব্যাখ্যা) করেন। ইতিহাস বিষয়েও তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর তাফসির গ্রন্থটির নাম 'জামিউল বায়ান আন তাবিলি আয়িল কুরআন'। আর ইতিহাস গ্রন্থটির নাম 'তারিখ আর-রুসুল ওয়াল মুলুক'। তাফসির ও ইতিহাস বিষয়ে তাঁর এ গ্রন্থ দুটি প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ। তিনি তাঁর তাফসির গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের তাফসির প্রণয়নে অগাধ পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দেন। তিনি তাফসির সম্পর্কীয় প্রচুর হাদিস সংগ্রহ করেন এবং হাদিসের আলোকে পবিত্র কুরআনের তাফসির প্রণয়ন করেন। এ কারণে তাঁর তাফসির গ্রন্থটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নিকট ঐতিহাসিক এবং সমালোচনামূলক গবেষণার জন্য এ তাফসির গ্রন্থটি বিশেষভাবে সমাদৃত। এভাবে তিনি ইতিহাস গ্রন্থে ধর্মীয় নীতি ও আইন সম্পর্কীয় বিষয়ে বহু বিবরণ উপস্থাপন করেন। তিনি ৯২৩ খ্রি. বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ইমাম গাযালি (র.) ও ইবনে জারির আত তাবারি (র.)-এর গুণাবলির উপর দশটি বাক্য তৈরি করবে।

পাঠ ১৩

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চায় মুসলমানদের অবদান

শুধু সাধারণ শিক্ষায় নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চায়ও মুসলমানগণ সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রচেষ্টা ও অবদানের উপর ভিত্তি করে মুসলমানগণ একসময়ে সারা বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আধুনিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনেক শাখা মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিরই ফসল। এ সকল মুসলিম মনীষীর মধ্যে কয়েকজন সম্পর্কে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

চিকিৎসা শাস্ত্র

চিকিৎসা শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান অবিস্মরণীয়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির মূলে রয়েছে মুসলমানদের অবদান। যাঁদের অবদানের কারণে চিকিৎসা শাস্ত্র উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- আবু বকর আল রাযি, আল বিরুনি, ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ প্রমুখ।

আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া আল রাযি

তাঁর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবু বকর, পিতার নাম যাকারিয়া। তিনি আল-রাযি নামে পরিচিত। তিনি ৮৬৫ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও শল্যচিকিৎসাবিদ ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি জুন্দেরশাহপুর ও বাগদাদে সরকারি চিকিৎসালয়ে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তৎকালে তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ থেকে অনেক রোগী তাঁর নিকট আসতেন।

শল্যচিকিৎসায় আল রাযি ছিলেন তৎকালের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর অস্ত্রোপচার পদ্ধতি ছিল গ্রীকদের থেকেও উন্নত। তিনি মোট দুই শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে শতাধিক হলো চিকিৎসা বিষয়ক। তিনি বসন্ত ও হাম রোগের উপর 'আল্ জুদাইরি ওয়াল হাসবাহ' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মৌলিকত্ব দেখে চিকিৎসা বিজ্ঞানের লোকেরা খুব আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তাঁর আরেকটি গ্রন্থের নাম হলো আল মানসুরি। এটি ১০ খণ্ডে রচিত। এ গ্রন্থ দুটি আল রাযিকে চিকিৎসাশাস্ত্রে অমর করে রেখেছে। তিনি হাম, শিশু চিকিৎসা, নিউরোসাইকিয়াট্রিক ইত্যাদি চিকিৎসা সম্পর্কে নতুন মতবাদ প্রবর্তন করেন। আল মানসুরি গ্রন্থে তিনি এনাটমি, ফিজিওলজি, মেজাজ, ঔষধ, স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি, চর্মরোগ ও প্রসাধন দ্রব্য, শল্যচিকিৎসা, বিষ, জ্বর ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি ৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

আল বিরুনি

বুরহানুল হক আবু রায়হান মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আল বিরুনি সংক্ষেপে আল বিরুনি নামে পরিচিত। ৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে খাওয়ারিযমের নিকটবর্তী আল বিরুন নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। আল বিরুনি ছিলেন মধ্যযুগীয় শ্রেষ্ঠ মুসলিম পণ্ডিত, মহাজ্ঞানী ও নিষ্ঠাবান গবেষক। তিনি অত্যন্ত মৌলিক ও গভীর চিন্তাধারার অধিকারী বড় দার্শনিক ছিলেন। গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, পদার্থ, রসায়ন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তিনি পারদর্শী ছিলেন। এ ছাড়া তিনি প্রসিদ্ধ ভূগোলবিদ, ঐতিহাসিক পঞ্জিকাবিদ, চিকিৎসাবিজ্ঞানী, ভাষাতত্ত্ববিদ ও ধর্মতত্ত্বের নিরপেক্ষ বিশ্লেষক ছিলেন। স্বাধীন চিন্তা, মুক্ত বুদ্ধি, সাহসিকতা, নির্ভীক সমালোচনা ও সঠিক মতামতের জন্য তিনি যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি আল উসতাদ (মহামান্য শিক্ষক) নামে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ভূগোলের অক্ষরেখার পরিমাপ নির্ণয় করেন। তাঁর লিখিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে 'আল-আছারুল বাকিয়্যাহ-আনিল কুরুনিল খালিয়্যাহ' গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ। এ গ্রন্থে তিনি বর্ষপঞ্জি, গণিত, ভূগোল, আবহাওয়া বিজ্ঞান ও চিকিৎসাসহ নানা বিষয় বর্ণনা করেন। তিনি প্রথম প্রমাণ করলেন যে, পৃথিবী গোলাকার। পৃথিবীর গোলাকার মানচিত্র তাঁর রচিত। তিনি ১০৪৮ খ্রি. ইন্তিকাল করেন।

ইবনে সিনা

তাঁর পুরো নাম আবু আলি আল হুসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সিনা। তিনি বুখারার নিকটবর্তী আফশানা নামক গ্রামে ৯৮০ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। দশ বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হিফজ করেন। তিনি দার্শনিক, চিকিৎসক, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ এবং মুসলিম জগতের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। চিকিৎসায় তাঁর অসাধারণ অবদানের জন্য তাঁকে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র ও চিকিৎসা প্রণালি এবং শল্যচিকিৎসার দিশারি মনে করা হয়। তাঁর রচিত অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে। তবে চিকিৎসাশাস্ত্রে 'আল-কানুন ফিত-তিবব' একটি অমর গ্রন্থ। ড. ওসলার এ গ্রন্থটিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের বাইবেল বলে উল্লেখ করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে এর সমপর্যায়ের কোনো গ্রন্থ আজও দেখা যায় না। আধুনিক বিশ্বেও তাঁর গ্রন্থটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে পাঠদান করা হচ্ছে। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যের আশ্চর্য রকম সমাবেশ থাকার কারণে গ্রন্থটিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের বৃহৎ সংগ্রহ বলা চলে। তিনি ১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

ইবনে রুশদ

তাঁর পুরো নাম আবু ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে রুশদ। তিনি স্পেনের করডোভায় জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যযুগে মুসলিমদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি তাঁদের একজন। এই ক্ষণজন্মা পুরুষ শুধু এক বিষয়েই জ্ঞানী ছিলেন না, তিনি জ্ঞানের সকল শাখায় বিচরণ করেছেন। দর্শন, পদার্থ, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্র- এ সকল শাখায় তাঁর সমান বিচরণ ছিল। তিনি এরিস্টটলের গ্রন্থসমূহ আরবিতে অনুবাদ করার পাশাপাশি নিজেও অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- 'আল জামি'। এ গ্রন্থে তিনি জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন ও চিকিৎসার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করা হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর লেখা গ্রন্থের নাম হলো 'কুল্লিয়াত'। এটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানে সমাদৃত হয়েছে।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান মধ্যযুগের মুসলমানদের চিকিৎসাবিজ্ঞানের কাছে অনেক ঋণী। মুসলমানদের ঐ অবদান না থাকলে আজকে চিকিৎসা বিজ্ঞান এতদূর আসতে পারত না। আমরাও চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে গভীর অধ্যয়ন করে চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সহজতর করে তুলব।

পাঠ ১৪

রসায়নশাস্ত্র

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ন্যায় রসায়নশাস্ত্রেও মুসলমানদের অবদান অনেক। আল-কেমি (রসায়ন) শাস্ত্রে মুসলিম বিজ্ঞানী জাবির ইবনে হাইয়ান, আল কিন্দি, জুননুন মিসরি, ইবনে আব্দুল মালিক আল-কাসি বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁদের নিরলস পরিশ্রম ও অকৃত্রিম অবদানের ফলে রসায়নশাস্ত্র আজ উন্নতির উচ্চশিখরে পৌঁছেছে।

জাবির ইবনে হাইয়ান

আবু আব্দুল্লাহ জাবির ইবনে হাইয়ান দক্ষিণ আরবের আযদ বংশে ৭২২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাইয়ানও একজন চিকিৎসক ছিলেন। গণিতশাস্ত্রে শিক্ষা লাভ শেষে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রেও শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি কুফায় চিকিৎসা জীবন শুরু করলেও এর মধ্যে তিনি রসায়নশাস্ত্রে উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি কুফায় একটি

বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করে মৃত্যু পর্যন্ত (৮০৪ খ্রি.) সেখানেই গবেষণারত ছিলেন। রসায়নকে তিনি সর্বপ্রথম বিজ্ঞানের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রসায়ন ও বিজ্ঞানের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যথা পরিস্রবণ, দ্রবণ, ভস্মীকরণ, বাষ্পীকরণ, গলানো প্রভৃতি তাঁরই আবিষ্কার। তিনি তাঁর গ্রন্থে ধাতুর শোধন, তরলীকরণ, বাষ্পীকরণ, ইস্পাত তৈরির প্রক্রিয়া, লোহার মরিচা রোধক বার্নিশ ও চুলের কলপ, লেখার কালি ও কাঁচ ইত্যাদি দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালি ও বিধি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। জাবির ইবনে হাইয়ান রসায়নশাস্ত্রের পরিপূর্ণতা দান করেছেন বিধায় তাকে এ শাস্ত্রের 'জনক' বলা হয়। তিনি ৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

আল কিন্দি

আবু ইয়াকুব ইবনে ইছহাক আল কিন্দি ৮০১ খ্রি. কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ইছহাক খলিফা মামুনের শাসনামলে কুফার গভর্নর ছিলেন। তিনি এরিস্টটলের ধর্মতত্ত্ব (Theology of Aristotle) আরবিতে অনুবাদ করেন। খলিফা মামুনের সময়ে জ্যোতির্বিদ, রসায়নবিদ, চিকিৎসক ও দার্শনিক হিসেবে তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আল কিন্দি নিউপ্লেটোনিজমের উদ্ভাবক ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম প্লেটো ও এরিস্টটলের মতবাদ সমন্বয় করার চেষ্টা করেন। তিনি অনধিক ৩৬৫টি গ্রন্থ রচনা করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁর মতে গণিত ছাড়া দর্শনশাস্ত্র অসম্ভব। দর্শন ছাড়াও তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, গণিত ও সংগীত বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি মাতৃভাষা আরবি ছাড়াও পাহলবি, সংস্কৃত, গ্রিক ও সিরীয় ভাষার সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

জুননুন মিসরি

তাঁর নাম ছাওবান, পিতার নাম ইবরাহিম। তিনি জুননুন মিসরি নামে পরিচিত। তিনি মিসরের আখমিম নামক স্থানে ৭৯৬ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুফি হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও আরব মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্যে রসায়নশাস্ত্রের উপর যাঁরা প্রথমদিকে গবেষণা করেন তাঁদের অন্যতম। তিনি রসায়নশাস্ত্রের বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে গবেষণা ও লেখালেখি করেন। তাঁর লেখায় সোনা, রুপাসহ বিভিন্ন খনিজ পদার্থের বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি মিসরীয় সাংকেতিক বর্ণের মর্মার্থ বুঝতেন। তিনি মিসরের আল জিজাহ নামক স্থানে ৮৫৯ খ্রি. ইন্তিকাল করেন।

ইবনে আব্দুল মালিক আল কাসি

তাঁর নাম আবুল হাকিম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল মালিক আল খারেজেমি আল কাসি। তিনি একাদশ শতাব্দীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাগদাদেই অবস্থান করতেন। তাঁর লেখা 'আইনুস সানাহ ওয়া আইওয়ানুস সানাহ' (Essence of the Art and Aid of worker) এ গ্রন্থটি রসায়নশাস্ত্রে মূল্যবান একটি সংযোজন। তিনি এ গ্রন্থে রসায়নের প্রত্যেক প্রয়োজনীয় শাখার সরল ও সহজ পন্থা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছেন। যে সকল বস্তু 'সাদা' এবং যে সকল বস্তু 'লাল' এদের ব্যবহার ও পার্থক্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

পাঠ ১৫

ভূগোলশাস্ত্র

অজানাকে জানার আকাঙ্ক্ষা এবং বিস্তৃত এলাকার লোকদের কেবলা নির্ধারণসহ নানা প্রয়োজনে মানচিত্রের খুব প্রয়োজন দেখা দেয়। ইসলাম প্রচারক ও বণিকগণের জন্য দেশ-দেশান্তর ভ্রমণ করার তাগিদে ভূগোলের জ্ঞান অর্জনের খুব প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজন মেটানোর জন্য আল মোকাদ্দাসি, আল মাসুদি, ইয়াকুত ইবনে আব্দুল্লাহ ও ইবনে খালদুনসহ অনেক মুসলিম মনীষী ভূগোলশাস্ত্রে অসামান্য অবদান রাখেন।

আল মোকাদ্দাসি

তাঁর নাম মুহাম্মদ, পিতার নাম আহমাদ। তিনি ৯৪৬ খ্রি. বাইতুল মোকাদ্দাস এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন তাই আল মোকাদ্দাসি নামে পরিচিত। তিনি একজন বিখ্যাত পরিব্রাজক ও ভূগোলবিদ ছিলেন। তিনি স্পেন, ভারতবর্ষ ও সিজিস্তান ব্যতীত সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ভ্রমণ করেন। দীর্ঘ বিশ বছরের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি ৯৮৫ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থের নাম হলো 'আহসানুত তাকাসিম ফি মারিফাতুল আকালিম'। এই মনীষী ১০০০ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

আল-মাসুদি

তাঁর নাম আবুল হাসান আলি বিন হুসাইন আল-মাসুদি। তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে পরিব্রাজক, ইতিহাসবিদ ও ভূগোলবিদ ছিলেন। তিনি তাঁর ঐতিহাসিক 'ভূগোল বিশ্বকোষ'-এ তাঁর ভ্রমণসমূহের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করেন। পৃথিবীর আকার, আয়তন, গতি ও প্রধান প্রধান বিভাগগুলোর বিবরণ দেন। ভারত মহাসাগর, পারস্য সাগর, আরব সাগরের ঝড়ের অবস্থার কথা তিনি উল্লেখ করেন। ৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ভূকম্পন বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেন। তিনি ৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মিসরে ইন্তিকাল করেন।

ইয়াকুত ইবনে আব্দুল্লাহ

ইয়াকুত ইবনে আব্দুল্লাহ আল হামাবি পারস্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর 'মুজামুল বুলদান' নামক গ্রন্থখানি ভূগোলশাস্ত্রের এক প্রামাণ্যগ্রন্থ। এতে তিনি প্রত্যেক স্থানের ঐতিহাসিক, জাতিতাত্ত্বিক ও প্রাকৃতিক বিষয়ের বিবরণ দিয়েছেন। ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের পরিচয় ও ঘটনাসমূহ উল্লেখ করেছেন। তিনি ১২২৮ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।

ইবনে খালদুন

তাঁর নাম আব্দুর রহমান, পিতার নাম মুহাম্মদ। তিনি ইবনে খালদুন নামে পরিচিত। তিনি ১৩৩২ খ্রি. তিউনিসিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতির মূলে ছিল তাঁর ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ 'কিতাব আল-ইবার ওয়া দিওয়ান আল-মুবতাদা ওয়াল খাবার ফি-আইয়াম আল-আরাব ওয়াল আযম ওয়া বারবার' এটি সংক্ষেপে আল মুকাদ্দিমা নামে পরিচিত। এই গ্রন্থে ভূগোল বিষয়ে তিনি যেসব তত্ত্ব ও তথ্যের অবতারণা করেছেন তা তাঁকে ভূগোলশাস্ত্রে অমরত্ব দান করেছে। তিনি ১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

পাঠ ১৬

গণিতশাস্ত্র

গণিতকে বিজ্ঞানের মূল বলা হয়ে থাকে। এই গণিতশাস্ত্র আবিষ্কারের অগ্রগতি ও উন্নতির উৎকর্ষসাধনে মুসলমানদের অবদান অবিস্মরণীয়। আল-খাওয়ারেযমি, ইবনে হায়সাম, উমর খৈয়াম ও নাসির উদ্দিন তুসিসহ অনেক মুসলিম মনীষী এ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারেযমি

তাঁর নাম মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল খাওয়ারেযমি। ৭৮০ খ্রি. খাওয়ারেযম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গণিতশাস্ত্রের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাঁকে গণিতশাস্ত্রের 'জনক' বলা হয়। বীজগণিতের আবিষ্কারক হলেন তিনি। এ বিষয়ে তাঁর রচিত 'হিসাব আল জাবর ওয়াল মুকাবালাহ' গ্রন্থের নামানুসারে এ শাস্ত্রকে পরবর্তীকালে ইউরোপীয়রা আল-জেবরা নামকরণ করে। তিনি এ গ্রন্থে আট শতাধিক উদাহরণ সন্নিবেশিত করেন। সমীকরণের সমাধান করার ছয়টি নিয়ম তিনি আবিষ্কার করেন। এটি দ্বাদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়ে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পঠিত হয়। 'কিতাবুল হিসাব আল আদাদ আল হিন্দী' তাঁর পাটিগণিত বিষয়ক গ্রন্থ। তাঁর গণিতশাস্ত্র দ্বারা উমর খৈয়াম, লিওনার্ডো, ফিরোনাসসি এবং মাস্টার জ্যাকবসহ আরও অনেকেই প্রভাবান্বিত হয়েছেন। তিনি ৮৫০ খ্রি. ইন্তিকাল করেন।

হাসান ইবনে হায়সাম

হাসান ইবনে হায়সাম একজন চক্ষুবিজ্ঞানী (Optic Scientist) ছিলেন। তিনি ৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে তিনি শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। চক্ষুবিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থ 'কিতাবুল মানাযির' তাঁকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। মধ্যযুগে আলোক বিজ্ঞানের এটি একমাত্র গ্রন্থ ছিল। গবেষক রোজার বেকন, নিউলার্ডো, কেপলার প্রমুখ এ গ্রন্থের উপর নির্ভর করেই তাঁদের গবেষণা করেন। তিনি দৃষ্টি শক্তির প্রতিসরণ ও প্রতিফলন বিষয়ে গ্রিকদের ভুল ধারণা খণ্ডন করেন। তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, বাহ্যপদার্থ থেকেই আমাদের চোখে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়। চোখ থেকে বের হওয়া আলো বাহ্যপদার্থকে দৃষ্টিগোচর করায় না। তিনিই ম্যাগনিফাইং গ্লাস আবিষ্কার করেন।

আধুনিক কালের বিজ্ঞানীরা গতি বিজ্ঞানকে তাদের আবিষ্কার বলে দাবি করলেও ইবনে হায়সাম এ বিষয়ে বহু পূর্বেই বিস্তারিত বর্ণনা করেছিলেন। বায়ুমণ্ডলের ওজন, চাপ এবং তাপের কারণে জড়পদার্থের ওজনেও তারতম্য ঘটে। মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ে তিনি তাঁর গ্রন্থসমূহে বর্ণনা করেছেন। স্যার আইজ্যাক নিউটনকে (১৬৪২-১৭১৭ খ্রি) মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কিত শক্তির আবিষ্কারক মনে করা হলেও ইবনে হায়সাম এ বিষয়ে প্রথম ধারণা দিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। তিনি ১০৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

উমর খৈয়াম

তাঁর নাম উমর ইবনে ইবরাহিম আল খৈয়াম সংক্ষেপে উমর খৈয়াম। ১০৪৮ খ্রিষ্টাব্দে পারস্যে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণির গণিতবিদ। তাঁর 'কিতাবুল জিবার ওয়াল মুকাবালা' গণিতশাস্ত্রের একখানি অমর গ্রন্থ। ঘন সমীকরণ এবং অন্যান্য উন্নতশ্রেণির সমীকরণের পদ্ধতির বিশ্লেষণ এবং সংজ্ঞানুসারে এগুলোকে শ্রেণিভুক্ত করে উমর খৈয়াম বীজগণিতের অসাধারণ অগ্রগতি সাধন করেন। এ ব্যাপারে তিনি গ্রিকদের থেকেও বেশি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। পাটিগণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপরও তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১১২২ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

নাসির উদ্দিন তুসি

মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন তুসি ১২০১ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জ্যামিতি, গোলাকার, ত্রিকোণমিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে মোট ষোলটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ত্রিকোণমিতিকে জ্যোতির্বিজ্ঞান হতে পৃথক করে সমতল এবং গোলাকৃৎ ত্রিকোণমিতি সম্পর্কে বর্ণনা করেন। গণিতশাস্ত্র বিষয়ে প্রণীত তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে-মুতাওয়াসিতাত বাইনাল হান্দাসা

ওয়াল হাইয়া (The Middle Books between Geometry and Astronomy), জামিউল হিসাব বিত তাখতে ওয়াত্তোরাব (Summary of the Whole of Computation with Table and Earth), কাওয়ায়েদুল হান্দাসা, তাহরিরুল্ল উসুল অন্যতম। তিনি ১২৭৪ খ্রি. ইন্তিকাল করেন।

আমরা এসব মুসলিম মনীষীর ন্যায় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখার চেষ্টা করব। সেই অনুযায়ী জীবন গড়ব এবং দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন তুসি কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

২. 'হিসাব আল জাবর ওয়াল মুকাবালা'-কে রচনা করেন?

৩. প্রথম শ্রেণির গণিতবিদ কে ছিলেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সমকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'আল-কানুন ফিত-তিব্ব' গ্রন্থটির প্রণেতা কে?

ক. আল বিরুনি   খ. ইবনে সিনা

গ. আল রাযি   ঘ. ইবনে রুশদ।

২. খলিফা আল-মানসুর কাকে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নিতে প্রস্তাব দিয়েছিলেন?

ক. ইমাম গাযালি (র.)   খ. ইমাম শাফি (র.)

গ. ইমাম বুখারি (র.)   ঘ. ইমাম আবু হানিফা (র.)

৩. ন্যায়বিচার বলতে বোঝায়−

i. আইন অনুযায়ী বিচার করা

ii. গণ্যমান্যদের সম্মান প্রদর্শন করা

iii. সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

হাফিজ সাহেবের সন্তান যায়েদ বন্ধুদের সাথে মিলে খালেদকে প্রহার করে। খালেদ যায়েদের পিতার কাছে বিচারপ্রার্থী হলে তিনি তাঁর সন্তানকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি নেন।

৪. হাফিজ সাহেবের কাজের মাধ্যমে কোন খলিফার আদর্শ ফুটে উঠেছে?

ক. হযরত আবু বকর (রা.) খ. হযরত উমর (রা.)

গ. হযরত উসমান (রা.) ঘ. হযরত আলি (রা.)

৫. হাফিজ সাহেবের বিচারের ফলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে−

i. ভ্রাতৃত্ব

ii. শান্তি

iii. শৃঙ্খলা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সামাজিক প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে জনাব সিহাব চৌধুরী লোকমান সাহেবকে মারাত্মকভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করেন। কিছুদিন পর লোকমান সাহেব প্রতিশোধ নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও এ থেকে বিরত থাকেন। এ ধরনের উদারতা দেখে জনাব সিহাব চৌধুরীর মধ্যে বেশ পরিবর্তন আসে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, কোনো মানুষের সাথে আর অন্যায় আচরণ করবেন না। গোত্র-বর্ণ ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সকলের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। সকল কাজকর্মে কুরআন ও হাদিসকে অনুকরণ করে চলবেন।

ক. মদিনা সনদের ধারা কয়টি?

খ. রাসূলের জীবনাদর্শ অনুকরণীয় কেন?

গ. লোকমান সাহেবের আচরণে মহানবি (স.)-এর কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার আদর্শ ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সিহাব সাহেবের পরিবর্তন বিদায় হজ্জের ভাষণের আলোকে পর্যালোচনা কর।

২. জামিল সাহেব টঙ্গী এলাকার একজন শিল্পপতি। তিনি এলাকার মানুষের পানির তীব্র সংকট দূর করার উদ্দেশ্যে দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করে একটি পানির পাম্প স্থাপন করেন। এ ছাড়া এলাকায় মুসল্লিদের তুলনায় মসজিদ ছোট হওয়ায় উহা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করেন। তাঁর সহধর্মিণী মিসেস নাবিলা নিয়মিত সালাত আদায়ের পাশাপাশি ইসলামের মৌলিক বিধানগুলো মেনে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সংসারের সকল কাজ নিজ হাতে সম্পাদন করেন।

ক. কোন সাহাবি তাবুক যুদ্ধে সকল সম্পদ ব্যয় করেছিলেন?

খ. 'হযরত উমর (রা.) ছিলেন ন্যায় ও ইনসাফের এক মূর্ত প্রতীক'– বুঝিয়ে লেখ।

গ. মিসেস নাবিলা কাজের মাধ্যমে কোন মহীয়সী নারীর আদর্শের অনুকরণ করার চেষ্টা করেছেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জামিল সাহেবের কার্যক্রম হযরত উসমান (রা.)-এর জীবনাদর্শের আলোকে মূল্যায়ন কর।

সমাপ্ত

যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার কর
তখন ইনসাফের সাথে বিচার কর

আল-কুরআন

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য